চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা -- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা -- ১৮৫৮

[*কৃষ্ণকিশোর, এঁড়েদার সাধু, হলধারী, যতীন্দ্র, জয় মুখুজ্জে, রাসমণি*]

আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ আছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন।

আজ (৩১ শে) আশ্বিন, শুক্লা চতুর্থী তিথি; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমবার। আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখাল, রামলাল ও হাজরা আছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে আর দু-একটি ব্রহ্মজ্ঞানী ছোকরা আসিয়াছেন। আজ মাস্টারও আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিলেন। আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন, নরেন্দ্র আদি ভক্তেরা বিশেষতঃ নরেন্দ্র বিশ্রাম করিবেন। মাদুরের উপর লেপ ও বালিশ পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পচ্ছলে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) -- আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুলতা হত। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতাম।

"কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, 'আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল তুলে দেব?' কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল শিব। শিব শিব বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি।' সে 'শিব' 'শিব' বলে জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

"এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাব ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললাম, কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাব। তুমি যাবে? হলধারী বললে, 'একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?' হলধারী গীতা-বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে বললে 'মাটির খাঁচা।' কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ওই-কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল। আর বললে, 'কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা। সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়।' এত রাগ -- কালীবাড়িতে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না!

"আমায় বলেছিল, 'পৈতেটা ফেললে কেন?' যখন আমার এই অবস্থা হল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল! আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, 'তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ!'

তাই হল! তার নিজেরই উন্মাদ হল। তখন সে কেবল ‘ওঁ ওঁ’ বলত আর একঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, ‘ওগো, আমার রোগ আরাম কর, কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।’ (সকলের হাস্য)

“একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি হয়েছে?’ বললে ‘টেক্সোয়ালা এসেছিল -- তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।’ আমি বললাম, কি হবে ভেবে? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো ‘খ’ গো! (নরেন্দ্রাদির হাস্য) কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়ত কিনা। মাঝে মাঝে ‘তুমি খ’ বলে, ঠাট্টা করতাম। হেসে বললাম, ‘তুমি খ’; টেক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না।

“উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, বলতুম! কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হত না।

“যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। অমি তাকে বললাম, কর্তব্য কি? ইশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না? যতীন্দ্র বললে, ‘আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন!’ তখন আমার বড় রাগ হল। বললাম, ‘তুমি কিরকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরের ভক্তি -- এ-সব কিছু মনে হয় না। আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে। যতীন্দ্র একটু পরেই ‘আমার একটু কাজ আছে’ বলে চলে গেল।

“অনেকদিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, ‘তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা, সেটা মিথ্যাকথা হবে।’ আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হল। সে বলে পাঠালে, ‘আমার গলায় বেদনা হয়েছে।’

“সেই উন্মাদ অবস্থায় একদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম, জয় মুখুজ্জে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম!

“একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এল। পূজার সময় আসত আর দুই-একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইল।

“হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হল! কি উপায় করি, তখন মাকে ডাকতে ডাকতে ও-স্বভাব গেল।”

[*মথুরের সঙ্গে তীর্থ ১৮৬৮ -- কাশীতে বিষয় কথা শ্রবণে ঠাকুরের রোদন*]

“ওই অবস্থায় ঈশ্বরকথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে বসে বসে কাঁদতাম। মথুরবাবু যখন সঙ্গে করে তীর্থ লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়িতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুরবাবুর

সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি, রাজাবাবুরাও বসে আছে। দেখি তারা বিষয়ের কথা কইছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে -- এই সব কথা। আমি কাঁদতে লাগলাম, বললাম, 'মা, কোথায় আনলে! আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই।”

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে, একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন। নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।